ওঠো ওঠো সূর্যাই রে, ঝিকিমিকি দিয়া

তাপস ঘোষ

একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল আজ।

গত কিছুদিন হল--- দস্তয়েভস্কিতে, যাকে বলে, ডুবে আছি। পর পর ওনার চারটে উপন্যাস 'দ্য গ্যাম্বালার', 'খুড়োর স্বপ্ন', 'যাচ্ছেতাই কাণ্ড' ও 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেন্ট' পড়লুম। প্রথম তিনটে নদী ভৌমিকের উৎকৃষ্ট অনুবাদে ও শেষেরটি অণ সে ামের নিকৃষ্ট অনুবাদে। প্রথম তিনটে উপন্যাস পাঠের গতিজাড্যেই শেষেরটি পড়া হয়ে গেল। ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেন্ট এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। দেখা গেল প্রথম পাঠের কিছুই মনে নেই প্রায় --- বছর দশেক আগে পড়া অনুবাদটি এবারটার তুলনায় ভালো ছিল, স্মৃতি আমাকে শুধুএটুকুই জানালো।

দস্তয়েভস্কির উপন্যাস মানেই, সকলেই জানেন, স্বভাবিক মধ্যশ্রেণী নিম্নশ্রেণী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিধি থেকে ঝ'রে যাওয়া লে াকের মিছিল--- গৃহ নীড় নির্দেশ সকলি হারায়ে ফেলে যারা জানে না কোথায় গেলে মানুষের সমাজের পারিশ্রমিকের মতন নির্দিষ্ট কোনো শ্রমের বিধান পাওয়া যাবে! জানে না কোথায় গেলে জল তেল খাদ্য পাওয়া যাবে; অথবা কোথায় মুক্ত পরিচ্ছন্ন বাতাসের সিন্ধুতীর আছে। ক্রাইম অ্যাণ্ডপানিশমেন্টের রাসকল্‌নিকভ, সোনিয়া, সোনিয়ার বাবা সেমিওন, সোনিয়ার সৎ মা যক্ষারোগী কাতেরিনা সবাইসার বেঁধে চলেছে দুঃস্বপ্নে - দেখা চরিত্রদের মত, জানু ভেঙে প'ড়ে গেলে য াদের হাত কিছুক্ষণ আশাশীল হ'য়ে কিছু চায়--- কিছু খোঁজে; প্রকৃতই হাসপাতালে এসব হাঘরে হাভাতেদের জন্য অনেক বেডের প্রয়োজন; বিশ্রামের প্রয়োজন আছে; বিচিত্র মৃত্যুর আগে শান্তি কিছুটা প্রয়োজন।

গতকাল ছিল গদ্যকার দীপায়নবাবুর ভাষায় দেশভাগ দিবস অর্থাৎ ১৫ই আগস্ট। এবার ১৫ই আগস্ট রোববার পড়ায় ছুটিটা মার গেছে। ১৫ই আগস্ট কাগজের অফিস ছুটি থাকায় আজ সকালে খবরের কাগজের উৎপাত নেই। 'আজকাল' - এ খবরের পরিমাণ খুব কম থাকে বলে ওটা ছাড়াও এ বি পি লিমিটেডের ইংরেজী কাগজ 'দ্যা টেলিগ্রাফ' নিই সোম থেকে শনিবার ৬ দিন আর টেলিগ্রাফ খুললেই হলিউডের জেনিফার লোপেজ, ব্রিটনি স্পিয়ার্স, কেট উইনস্‌লেট ও মুম্ব াইয়ের কারিনা, কারিশমা, উর্মিলা ও জিস্‌ম -খ্যাত বিপাশা বসুর থাই - পেট - পাছা- মাই, মাই - পেট - পাছা - থাই, পাছা- মাই - পেট - থাই ও যোনির আভা, দেখতেদেখতে দেখতেদেখতে....।

খবরের কাগজ পড়ার জন্য বরাদ্দ সময়টাতে আজ মিলারের 'দি এয়ারকণ্ডিশন্‌ড নাইটমেয়ার' -টা নিয়ে আমার লেখার টেবিলে বসলুম। আমার বন্ধু অমিয় বলে, মিলারের লেখা অন্য লেখকদের ডাউন-হয়ে যাওয়া ব্যাটারি মুহূর্তে রিচার্জ করে দেয়। আর এইবইটা মিলার লিখেছেন, গোটা মার্কিন সভ্যতার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে, প্রতিটি পংক্তিতে তাঁর ক্রোধের লাভ াস্রোত বইছে। আমেরিকান সভ্যতার উচ্ছিষ্ট মানুষদের দেখতে শিল্পী - বন্ধু এব র‍্যাটনারের সংগে এক অদ্ভুত জার্নিতে বেরিয়েছেন মিলার। এখন ওঁরা শিকাগোর দক্ষিণ দিকে মেক্‌কা অ্যাপার্টমেন্টে -- যাকে উনি অভিহিত করেছেন সভ্যতার ব্যাকডোর বলে।

'এক বিশাল, বিশৃংখল পাগলাগারদ। কুকর্ম ও রোগব্যাধি ছাড়া আর কিছুরই শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে পারে না এখানে।'

'দেখ ঐ যে দাঁড়িয়ে আছে ও-ই এই বইটার আসল লেখক --- an outcast, a freak, a hawker of snake oil.'এরকম ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্ত পংক্তি ছড়িয়ে আছে বইটার পাতায় পাতায়। মেক্‌কা অ্যাপার্টমেন্টে একটি পুষ ও একটি নারী ব্য

ালকনির রেলিং- এর ওপর দিয়ে ঝুঁকে অভিব্যক্তিহীনভাবে মিলারদের দিকে তাকিয়ে আছে
'Just looking. Dreaming? Hardly. Their bodies are too worn, their souls too stunted, to permit indulgence in that cheapest of all luxuries.'
মিলারের এই লাইনটাই রিচার্জ করল আমার ডাউন - হয়ে - যাওয়া ব্যাটারি। ঐ 'জাস্ট লুকিং' শব্দবন্ধটির মধ্যে আমি আমার দিকে গুড়িয়ার অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে - থাকাটা দেখতে পেলুম আবার।
আমাদের কোম্পানীর আসানসোলস্থিত যে ছোট কলোনীটায় আমি থাকি সেখানে একজিকিউটিভদের প্রতিটি বাংলা বা ফ্ল্যাটের জন্য আউটহাউসের এক - একটি ঘর নির্দিষ্ট রয়েছে যেখানে সেই ফ্লাট বা বাংলোর কাজ করা মহিলাটি সপরিব ারে থাকার সুযোগ পায়। এই রকম একাধিক রূপ নিয়ে কংক্রিটের বস্তির মত এক একটা আউটহাউস। এই কলোনীটায় তিনটে এরকম আউটাহাউস আছে। এখানে আমার প্রায় দশ বছর থাকা হয়ে গেল। এখনকার ফ্ল্যাটে শিফ্ট করার আগে যে বাংলাটায় আমি থাকতুম তার সামনেরআউটহাউসে গুড়িয়া ওর বাবার সংগে থাকত। এর বাবা লম্বা শীর্ণ দারিদ্র্যে দুমড়ে যাওয়া একটা লোক -- তার নাম ছিল জন । ওরা খ্রীষ্টান। জনের প্রথম বৌটা নাকি বেশ গায়েগতরে ছিল। সেই গতর নিয়ে এই ঝি-গিরি । জনের প্রথম বৌটা নাকি বেশ গায়েগতরে ছিল, সেই গতর নিয়ে এই ঝি- গিরি তার পোষায় নি, একটা মেয়ে হয়ে যাবার পর আসানসোলের রেডলাইট এরিয়া লছিপুরে থাকা পছন্দকরে। জনের প্রথম পক্ষের মেয়েটা বিয়ে হবার পর এখানকারই কোনো আউটহাউসে থাকে। জনের দ্বিতীয় পক্ষের বৌ মানে গুড়িয়ারমা মারা যায় যক্ষায়, তাকে আমি দেখি নি, জনকে দেখেছি, সেও মারা যায় যক্ষায়, তার ভূত নাকিএখনও ঐ আউটহাউসের আশপ াশেঘুরে বেড়ায়। আমরা যখন ঐ বাংলোয় থাকি, গুড়িয়া তখন ছোট একটা মেয়ে ১৩/১৪ বছর বয়স, জন তখনও বেঁচে। গুড়িয়া আমাদের বাগানে ওর দলবল নিয়ে ঢুকে প্রচন্ড জ্বালাতন করত, ওকে গালাগালি করেছি অনেক, খুবই বেহায়া ধরনের ছিল, ওর প্রাণশক্তি প্রাচুর্যে বিরক্ত হতুম খুবই। ঐ বাংলোটায় জলের সমস্যা ছিল তদুপরি আউটাহাউসের উৎপ াতে বিরক্ত হয়েই বছর চারেক আগে এই ফ্ল্যাটটায় শিফ্ট করি। বছর দুয়েক আগে গুড়িয়া এখানকার একটা আউটাউসে - থাকা ছেলেকে বিয়ে করল, গুড়িয়া খ্রীষ্টান বলে এই ছেলেটির মা আউটহাউসে যে ঘরে থাকত সেখানে ওর জায়গা হল না, ওরা থাকা শু করল আমাদের ফ্ল্যাটের সামনের আউটহাউসটার পায়খানায়। আউটহাউসগুলোর প্রত্যেকটায় একটা চানের ঘর ও তিনটে পায়খানা থাকলেওকোনোটাই সে কাজে ব্যবহার হয়না। যাদের বাড়িতে কাজ করার মত পা লিয়ে গিয়ে তাদের ভাসিয়ে দিয়ে গেছে বলে তো তারা এতদিন যেখানে থেকেছে সে জায়গা ছেড়ে চলেযেতে পারে না, অ ার যাবেই বা কোন চুলোয়, তারাই এসব চান পায়খানার ঘরে থাকে। এই আউটহাউসটার চানের ঘরে থাকে ভজন আর তার অথর্ব মা --- ভজনের বৌ মরে গেছে, মেয়েটারও কোথায় একটা বিয়ে হয়ে গেছে। আর পায়খানা তিনটের মধ্যে দুটে া দেয়াল ভেঙে ফেলে বালি দিয়ে পায়খানার প্যানগুলো ভরে দিয়ে তার ওপর চৌকি পেতে থাকে গুড়িয়া, ওর বর আর ওদের সাতআট মাস ছেলেটি।
তো আউটহাউসের সবাই পায়খানা করে কোথায় এটা একটা প্রশ্ন বটে। করে যে নালাগুলো কলোনীর নিকাশী ব্যবস্থার অংশ সেগুলিতেও কলোনীর পেছনের পাঁচিল টপকে গিয়ে রেল লাইনের ধারে আর কখনো কোনো বাংলো একজন ছেড়ে দেবার পর অন্যজনকে অ্যালট করার মধ্যবর্তী সময়ে ফাঁকা বাংলোর বাগানে।
পল্লবীকে জিগেস করি, গুড়িয়া কোনো একটা বাড়িতে কাজ ধরে না কেন, তাহলে তো এর চেয়ে ভালো একটা ঘর পায়, ব াচচাটাকে নিয়ে ওরকম জানালাহীন অস্বাস্থ্যকর জায়গায় থাকতে হয় না।
পোলোকে প্রশ্নটা করি ওর কাজের লোক পালের সামনে, পালই আউটহাউস - সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য আমাদের দেয়। প্রশ্ন টা ওকেই করা হয়েছে বুঝে নিয়ে পাল বলে, ওকে কাজে কে রাখবে --- এর তো টিবি হয়েছে।
সর্বনাশ, ঐটুকু বাচচাকে নিজের কাছে রাখে ওরকম ভয়ংকর অসুখ নিয়ে? এখন তো টিবির ওষুধ বেরিয়ে গেছে, হাসপ াতালে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিনে পয়সায় ওষুধ দেয়। ও ওষুধ খায় না কেন? --- পোলোর দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করি।
পাল ঝাঁজিয়ে ওঠে, ওষুধ দিয়ে কি হবে, কয়েকজন দিদিমণি এসে ওষুধ তো দিয়ে যায়, কিন্তু খেতে না পেলে কি সারে এই অসুখ? বরটা তো কিছু করে না, কখনোসখনো ঘরবাড়ী রং-এর কাজ পেলে করে। তাতে কি টিবি রোগীর খাবার জোটে? এই রোগ হলে ভালোমন্দ খেতে হয়---
এই মৌলিক প্রশ্নের সামনে থতমত হয়ে চুপ করে যাই। তো, পালের সংগে এই পরোক্ষ কথোপকথনের পর থেকে আমি

গুড়িয়ার ওপর লক্ষ্য রাখতে থাকি। কত বয়স হবে এর এখন --- টিন - এজ পেরিয়েছে কি পেরোয় নি--- আমার হিসেবমত খুব বেশিহলে কুড়ি-একুশ, ওর শরীর থেকে এই বয়সের সব লাবণ্য কিসে যেন শুষে নিয়েছে, হাড়ের ওপর চ ামড়া সর্বস্ব চেহারা। চোখ দুটো প্রতিদিন ক্রমশ কোটরাগত হচ্ছে। দুটো স স ঠ্যাং -এর মধ্যে মুখ ঝুঁকিয়ে আমাদের ফ্ল্য াটের জানালার সামনে ও উল্টোদিকের ওদের আউটহাউস, যেটার পেছর দিকটা এখান থেকে দেখা যায় তার পাশের স রাস্তাটায় বসে থাকে। আর রোদের প্রখর আলোয় যক্ষারোগীদেরর বোধহয় বেশি কুৎসিত দেখায়। একটু দূরে ওর বাচচ াটা, সেটা রাস্তায় হামাগুড়ি দেয়। আউটহাউসের অন্যেরা ওর সংগে কথা বলে একটু দূর থেকে--- কেউ একটা খুব বেশি কথাও বলে না ওর সংগে, অত্যন্ত মুখরা এবং টিবি হওয়ার পর থেকে আরো বেশি ঝগড়াটে হয়ে ওঠার জন্য। কিন্তু ইদ ানীং বোধহয় ঝগড়া করার ক্ষমতাও আর নেই। দুটো কাঠির মত ঠ্যাং --- হাড়সর্বস্ব হাঁটু দুটোর মধ্যেমুখডুবিয়ে দুটো হ াত ও দুটো পায়ের ভরে কিরকম অদ্ভুত চারপেয়ে জীবের মত চলে। চলে মানে সকালের দিকটায় ওর পায়খানা - ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তাটায় আসে--- আবার পরে রাস্তা থেকে হামা দেওয়া বাচচাটাকে একহাতে টেনে নিয়ে তিন হাত পায়ে ঘষটে ঘষটে ঐ পায়খানা - ঘরে ঢুকে যায়।

ওর ঐ ঘরের পাশ দিয়ে একটা স রাস্তা আমাদের গাড়ী - রাখার গ্যারেজের দিকে চলে গেছে। এই স রাস্তাটা ওর রাস্তার পাশের নালীটা আউটহাউসের মেয়েদের পেচ্ছাপ ও বাচচাদের পায়খানার জায়গা হয়ে ওঠার রাস্তাটা আমরা সাধ ারণত ব্যবহার করি না শুধু গ্যারেজ থেকে গাড়ি আনতে যাওয়ার সময় ছাড়া। শহরের আউটস্কার্টে আমাদের কোম্পানীর যে টাউনশিপে আমি আগে থাকতুম সেখানে বাংলো বা ফ্ল্যাটের সংগেই গাড়ী রাখার গ্যারেজ। কিন্তু এই কলোনীটা অ াসানসোল শহরের একটা প্রাইম লোকেশনে, এখানে গাড়ি রাখার গ্যারেজ। কিন্তু এই কলোনীটা আসানসোল শহরে একটা প্রাইম লোকেশনে, এখানে গাড়ি রাখার জন্য একটা সেন্ট্রালইজড্ গ্যারেজ আছে, তাও চারদিক ঘেরা নয়, মোটা মোটা স্টিলের অ্যাংগেলের স্ট্রাকচারের ওপর করোগেটেড স্টীল শিটে ছাওয়া একটা বিরাট শেড - এর তলায় সবাইয়ের গাড়ি রাখার জায়গা। ঐ গ্যারেজ যাবার শর্টকাট গুড়িয়াদের আউহাউসের পাশের রাস্তাটা। পাল থাকে অন্য একটা অ াউটহাউসে, সেটায়ও যেতে হয় ঐ রাস্তা দিয়েই। তবে এই রাস্তা ব্যবহার করার দরকার হয় সপ্তাহান্তে একবার, যখন গ্য ারেজ থেকে গাড়িটা এনে রোববার সকালে ওটা ধোওয়াই অথবা যে সপ্তাহে আকাশ ও ওর বন্ধু শৌভিককে কম্পিউটার টিউশন থেকে নিয়ে আসার পালা থাকে আমার, সেই দিনটায়। বি আই এফ আর - এ থাকা গ্ন কারখানার একজন ইঞ্জি নীয়ার, মাত্র মাস পাঁচেক আগেও যাকে মানসিকভাবে সবসময় তৈরী থাকতে হত যে যখনতখন প্রাইভেটাইজড্ হয়ে যেতে পারে তার কারখানাটিএবং ভি আর এস দিয়ে বসিয়ে দিলে একটা পোকার মতই মূল্যহীন হয়ে যেতে পারে তার সামা জিক অস্তিত্ব --- সে এর চেয়ে বেশি বিলাসিতা করতে পারে না।

গত সপ্তাহে, বুধ না বেস্পতিবার সেটা আজ আর মনে নেই --- ভোরবেলা হাঁটতে বেরিয়ে দেখি গেটের সামনে সিকিউরিটি গার্ডের ছোট গুমটিটার সামনে ছোটখাটো একটা ভিড়। এত ভোরবেলা এখানে ভিড় থাকার কথা নয়, খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি পাশের ল্যাম্পপোস্টটায় একটা রোগা ডিগডিগে চেহারার ছেলেকে বেঁধে রাখা, পাশে একটা সাইকেল - ভ্যান, ভ্যানে পু ঢালাই লোহার তৈরী একটা ড্রেনের ঢাকনা ও একটা স্টীলের এ্যাংগেলের খুঁটি --- যার এক প্রান্ত কর াত দিয়ে সদ্য কাটার দণ মরচেবিহীন রূপোলি। রাতডিউটিতে থাকা বুড়ো সিকিউরিটি গার্ডটাই ধরেছে ছেলেটাকে, ওদের রাতাডিউটির সময়টা লম্বা--- রাত আটটা থেকে সকাল আটটা, সকাল ডিউটির সময়টা জানি না। এই বুড়োট াকে একটা ক্যাপ পরে সিকিউরিটি গার্ডের পোষাকে গেটের সামনে চেয়ারে বসে থাকাঅবস্থায় যতবার দেখি ততবার ক াফকার 'মেটামরফোসিস' গল্পের পোকায় রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া গ্রেগর সামসার বার বার কথা মনে পড়েআমার। গ্রেগরের চাকরির চলে যাওয়ার পর ওর বাবাকেও বাধ্য হয়ে বুড়ো বয়সে এরকম একটা প্রাইভেট সিকিউরিটি গার্ডের চ াকরি নিতে হয়েছিল না? আমার ধারণা, পোকায় রূপান্তরিত হবার পর গ্রেগরের চাকরি যায় নি, আসলে চাকরি চলে য াওয়াতেই গ্রেগরের সামাজিক অস্তিত্ব ঐ পোকার মত মূল্যহীন হয়ে পড়ে, ঘটনার পরম্পরা বদলে দেওয়াটা প্রকৃত প্রস্তাবে কাফকার শিল্পকৌশল তথা মাস্টারি --- যেটা না করলে গল্পটা শরৎচন্দ্রের লেখা গল্পের মত মানবিক ও কাঁদুনে তথা অসত্য হয়ে উঠত, চাকরি - চলে - যাওয়া গরীবতম যুবকের এমনকি নিজের পরিবারেও অপ্রাসংগিক হয়ে যাওয়া অম ানবিক পোকা - অস্তিত্বের বাস্তবতা ওভাবে বিন্দুমাত্রও ধরা যেত না।

গ্রেগরের বাবা আমায় জানায় ও রাতডিউটিতে ছিল, ভোরবেলা পায়খানা করতে গেছে, ফিরে এসে দেখে আউটহাউসের একটা ছেলে এই ভ্যানওলাটাকে নিয়ে এই লোহার জিনিসগুলো চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে। ভোরের দিকটা পাহারা শিথিল থাকে এটা সম্ভবত আউটহাউসের ছেলেটা খেয়াল করেছিল, গার্ডটা তেড়ে আসতে সে পালালেও সাইকেল-ভ্যান চালক, তার টিজি যোগার করার এই ভ্যান প্রাণে ধরে ছেড়ে পালাতে পারে না। আউটহাউসের ছেলেটা কে? এই প্রশ্ন করে জানি, ঐ অমিত রায় সাহেবের বাড়িতেযে মহিলা কাজ করে তারই ছেলে। অমিতদার স্ত্রী মারা গেছেন বছর চারেক আগে ক্যানসারে, একমাত্র মেয়ে বিয়ের পর বর্ধমানে স্বামীর সংসার। তার মানে, ওকে আউটহাউস থেকে তাড়িয়েও দেওয়া যাবে না, ভাবি আমি।

মর্নিং ওয়াক করে এসে সকালের দাঁত মাজার আগের চা-টা পাল নিয়ে এলে, পোলোকে জিগেস করি, অমিতদার বাড়ীতেযে কাজ করে তার ছেলেটা কে?
পাল উত্তর দেয়, ও-ই তো গুড়িয়ার বর। খিরিস্তান নীচু জাতের মেয়ে বিয়ে করেছে বলে ওর মা ওকে ঘরে নেয় না।
তার মানে এটা আরো একটা সর্বনাশ হল, একে টিবি বলে গুড়িয়া কোনো বাড়ি কাজ করতে পারে না, এবার ওর বর পালিয়ে যাওয়ায় --- সে যেটুকু খুদকুঁড়ো যোগাড় করে আনত --- তা চুরিজোচ্চুরি যা করেই হোক, সে সংস্থানও গেল। ওর ফিরে আসার আশু সম্ভাবনাও নেই কেননা ফিরলে তাকে পুলিশে দেওয়া হবে। তার মানে---! আর কোনো মানেটানে খুঁজে পাইনা বলে কথাও বাড়াই না।
গতকাল ১৫ আগস্ট সকালে গাড়ি আনতে যাবার সময় রাস্তায় গুড়িয়ার বাচ্চাটাকে দেখি, গুড়িয়াকেও। ওর কোটরে ঢুকে যাওয়া চোখে কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে ও আমাকে দেখছে। দ্রুত ওদের পাশ কাটিয়ে গ্যারেজের দিকে চলে যাই।
মে ২০০৪ -এ শেষ হওয়া লোকসভা ভোটে বি জে পি হেরে গিয়ে নতুন কংগ্রেস সরকার আসার পর ঈশ্বর আমাদের কারখানার দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন মনে হচ্ছে। ঈশ্বর মানে নতুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি মাস খানেক আগে স্বয়ং এই শহরে এসে অভয় দিয়েগেছেন, আগের সরকারের মত এই কারখানা বন্ধ করতে কোমরে কোনো গামছা তিনি বাঁধেন নি। তদুপরি কোম্পানীর কর্মীদের নতুন গ্রেড ইমপ্লিমেন্টেশনের ঘোষণাও করে গেছেন তিনি। যে ইউনিটটি বেচে দেবে বলে কোম্পানীর দিল্লীতে বসে থাকা কর্তারা গত চার বছর ধরে নিয়মিত হুমকি দিয়ে চলেছে এবং এই অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত স্তরের কর্মীদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে তারা কাদাময় পিছল মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা; ভোট দিয়ে জনমতামতে মিশে যাওয়া মানুষের বেশি কিছু নয়; সেখানে মন্ত্রীর এই ঘোষণা স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে এখানকার আতংকে - থাকা কর্মীদের ত্রাণকর্তার আসনে বসিয়েছে। যদিও মন্ত্রীর ঘোষণার পরেও লোকাল ম্যানেজমেন্ট নতুন পে - স্কেলদিতে টালবাহানা করছে বলে অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন প্রোটোকল বাধ্য না করলে এক্সিকিউটিভদের ম্যানেজমেন্ট - আয়োজিত কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করার অনুরোধ করে একটা বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। অনুষ্ঠান বলতে ১৫ই আগস্ট স্টেডিয়ামে ম্যানেজিং ডিরেক্টর - এর পতাকা উত্তোলনের দিকেই পরোক্ষে ইংগিত করা হয়েছিল বিজ্ঞপ্তিটিতে।
গত - পরশু সন্ধ্যেবেলা সাবিত্রীর ফোন। পোলোকে ও জানায় গতকাল সকালে আসবে আমাদের ফ্ল্যাটে। সাবিত্রীর বর রাজুআমাদের অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের কাউন্সিল সেক্রেটারি, আমার ব্যাচমেট হলেও এখন রীতিমত হোমরা - চোমরা। আমার কাছেতার অনাহুত হয়ে আসা একটু আশ্চর্যের ব্যাপারই--- যদিও শহরের আঁচলকিনারের চাউনশিপটায় থাকার সময় ওরা আমাদের মুখোমুখিফ্ল্যাটে থাকত --- এবং এর বৌ সাবিত্রী -- ঐ দক্ষিণ ভারতীয় যুবতীটি, বছর - আড়াইয়ের আকাশকে খুবই ভালবাসত এটা আমায় স্বীকার করতেই হবে। সকালবেলা ঘুম ভেঙে উঠে দরজা খোলা পেলেই ছোট ছোট পায়ে গুণ্ডা হাওয়া। তখন ওর দু-আড়াই বছর বয়স,কাজেই তখনো স্কুলটুলের পাট শু হয়নি আর গুণ্ডার জন্য সাবিত্রী যে প্রায় উন্মুখ হয়ে থাকত, সেটা গুণ্ডা ওদের দরজা ঠেলতে না ঠেলতেই যেভাবে দরজা খুলে ওকে কোলে তুলে নিত সেটা দেখলেই বোঝা যেত। এ ব্যাটার লোভ ছিল সাবিত্রীর তৈরি ধোসায় আর সাবিত্রীর মেয়ে ব্বতার সংগে খেলা করায়। ব্বতার বয়স তখন পাঁচ-ছ বছর, মেয়েটা ঐ বয়সেই তামিল, তেলেগু, হিন্দী ও বাংলা চারটেভাষা ফ্লুয়েন্টলি বলতে পারত, আকাশ আসলে ওর কাছেই বাংলা বলাটা ভালো করে শেখে। আর শেখে ঐ বয়সেও সর্বক্ষণ প্যান্ট পরে থাকা। ব্বতার 'এমা আকাশ, তুমি ন্যাংটো?' --- এই ডায়লগ এখনো আমার কানে লেগে আছে।

ফোন রেখে পোলো বলে, রাজুর কাল সকালে আমাদের এদিকে কি কাজ আছে, সাবিত্রী বলেছে ও আমাদের ফ্ল্যাটে থাকবে, রাজুর কাজ হয়ে গেলে রাজু ওকে তুলে নেবে।

পোলোর দাঁত তোলা হয়েছিল গত সপ্তাহে। সকালে দাঁতের স্টিচ কাটিয়ে এনে ওকে কলোনীর গেটের কাছে ছেড়ে দিই। সাবিত্রী আসবে তাই ও ফ্ল্যাটে ফিরে যায় আর আমি যাই আমাদের কলোনীর ক্লাবে --- সেখানেও আজ একটা ফ্ল্যাগ হয়েস্টিং সেরেমনি হয়। আকাশ ওর পড়া ছেড়ে আসবে না, সামনেই ওর ক্লাস টেনের প্রিটেস্ট, ওরা যাকে বলে প্রিমক। ক্লাবে গিয়ে রাজুকে ওখানে দেখে একটু অবাকই হয়ে যাই, আরে সাবিত্রী বলে নি তো রাজু আমাদের ক্লাবে আসবে। পরে দেখি শুধু রাজু নয়, অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের অন্যান্য সব হোমরাচোমরা, আমাদের এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্ট (প্রোজেক্ট) থেকে শু করে তাবড় সব সিনিয়র অফিসাররা--- সবাইআমাদের ক্লাবের পতাকা উত্তোলনের অনুষ্ঠানে হাজির। পতাকা উত্তোলনের পর কয়েকটা দেশাত্মবোধক গানটান হয়। আমি আর আমাদের উল্টো দিকের ফ্ল্যাটের আকাশের ক্লাসে পড়া ডাঃ ঘটকের মেয়ে রিমি বেসুরে, 'মুত্তিরো মোন্দিরো সোপানোতলে কতো প্রাণ হোলো বোলিদান' গাই, অন্যান্য ছোটরা, মহিলা এমনকি আমাদের বাঙালী এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর (প্রোজেক্ট) অবধি আমাদের সংগে গলা মেলান। হিসেবের বাইরের অতিথিরা এসে যাওযায় আমাকে অতিরিত্ত মিষ্টির বাক্স আনতে সামনের মিষ্টির দোকানে যেতে হয়।

অনুষ্ঠান শেষে রাজু আমাদের ফ্ল্যাটে এলে হাসতে হাসতে ওকে জিগাই, কি ব্যাপার, তোমাদের কোনো গোপন মিটিং ছিল নাকি আমাদের ক্লাবে?

ও ভেঙে বলে পুরো ঘটনাটা। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করার খারাপ প্রতিত্রিয়া হতে পারে বলে, অ্যাসোসিয়েশনের কর্তাব্যত্তিরা সিনিয়র অফিসারদের সংগে গতকাল সন্ধ্যেয় একটা গোপন মিটিং করে--- সেখানেই ঠিক হয় স্টেডিয়ামে এ ডি-র বা প্ল্যান্টে ই ডি (ওয়ার্কস) -এর ফ্ল্যাগ হয়েস্টিং-এ অংশগ্রহণ না করলেও টাউনশিপের কোনো এক জায়গায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে তাদের অংশগ্রহণ করাটা প্রয়োজন। এখন আমাদের কোম্পানীর শহরের আউটস্কার্টের টাউনশিপটায় ইদানীং না - অফিসার সাধারণ কর্মীদেরও ফ্ল্যাট অ্যালট করা হচ্ছে; সেখানে এদের উপস্থিতি পরের দিন গোটা প্ল্যান্টে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াবে বলে ঠিক হয় সবাই আমাদের কলোনীর ক্লাবের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে।

রাজুকে জিগেস করি, কি মনে হচ্ছে, কারখানাটা বাঁচবে?

রাজু বলে, দেখ, সত্যিই পাঁচ -ছ মাস আগেও মনে হচ্ছিল আমাদের কুলটি ইউনিটটার মত এই উইনিটটাও হয় বন্ধ নয় প্রাইভেটইজড্ করে দেবে--- দিয়ে শুধু মাইন্স্গুলোই চালাবে, এখন তো অন্তত সেই ইনসিকিউরিটিটা কেটেছে --- কাজেই হাল ছেড়েদেবার মত কিছু হয় নি এখনও। আমাদের সবচেয়ে বড় ভরসা কি জানো , নতুন মন্ত্রীর আমাদের প্ল্যান্টের ব্যাপারে একটা পজেটিভ অ্যাটিচ্যুড আছে --- অ্যাণ্ড দ্যাট ইজ মেকিং আ বিগ ডিফারেন্স! আমি হাসি, হ্যাঁ, আমি তো মাইন্স্ -এ যাবার জন্য বেডিং বেঁধেই রেখেছিলুম---

পোলো সাবিত্রী আর রাজুকে খেয়ে যেতে বলে। রাজু 'আজ অনেক কাজ, পরে একদিন এসে খেয়ে যাবো' বলে সাবিত্রীকে নিয়ে চলে যায়।

দুপুরে পোলো বাথমে চানে ঢুকলে কলিং বেল বাজে। দরজা খুলে দেখি, বহুদিন বন্ধ থাকা কুমারডুবি মেটাল কাস্টিং অ্যাণ্ড ইনজিনিয়ারিং (রোলিং মিস্স্ জিভিশন) - এর দুজন শীর্ণ শ্রমিক। শীর্ণ বলেই কি তাদের অতটা লম্বা দেখাচ্ছিল?

প্রথমজন আমায় তার এখনও - যত্ন - করে - রেখে - দেওয়া কারখানার আউডেনটিটি কার্ডটি দেখায় ও সাহায্য চায়। আমাদের কলোনীতে কে কে সাহায্য দিয়েছে তার তালিকা দেখায়। সবায়ের নামের পাশেই ১০ টাকা দেখে আমিও দশ টাকা দিই। কিছু কথাবার্তা বলি। ওরা বলে, কালই আদালতে মীমাংসা হবার কথা কারখানা আবার খুলবে, না ওদের প্রাপ্য টাকা পয়সা দিয়ে দেওয়া হবে। কারখানাটা টাটা আর বিহার সরকারের যৌথ মালিকানায় চলত।

পোলো চান সেরে বেরিয়ে জিগেস করে, কাদের সংগে কথা বলছিলে?

ওদের কথা বলি পোলোকে। পোলো বিষণ্ণভাবে হাসে কুমারডুবির লোকগুলো তো, ওদের ওরকমই ধারণা, অনেক দিন অন্তর অন্তর কোর্টের ডেট পড়লে কেসের খরচা তোলার জন্য চাঁদা নেয়, প্রতিবারই বলে, এবার ওদের একটা কিছু হিল্লে করে দেবে কোর্ট, কারখানা না খুলুক, ওদের টাকাপয়সাগুলো অন্তত এবার পেয়ে যাবে ওরা।

পোলোর কথা শুনে আমিও হাসি, হাসব না তো কি কাঁদবো, বলি, আর ওদের টাকাপয়সা পেয়েছে ওরা।

পোলো বলে, এবার ভোটে গভর্ণমেন্ট চেঞ্জ না হলে তোমাদেরও ঐ হাল হত, কুলটির ইউনিটটা তো বন্ধকরে দিল, এবার জিততে পারলে বিজেপি তোমাদের এখানকার ইউনিটটাও বন্ধকরে দিত।

আমি পোলোকে কারেক্ট করি, ‘আমাদের নয়, আমাদের কারখানার সাধারণ কর্মীদের হত ঐ হাল। আমাদের রাস্তায় দঁাড় করানো অত সহজ নয়, আমরা টেকনোক্রাট , হিটলার মুসোলিনির অবধি ইঞ্জিনীয়ারদের প্রয়োজন হয়েছিল। বিজেপি তো কালকের ফ্যাসিস্ট।’ মুখে একথা বলি বটে, কিন্তু বলে বুঝি এটা মিথ্যে বাহাদুরি নেওয়া হল। প্রকৃত প্রস্তাবে এমন একটা কারখানায় কাজ করি যে,চাকরির একুশ বছর পরেও আমি বড়লোক না গরিবলোক সেটাই বুঝে উঠতে পারলুম না। খুব অশ্লীল ধরনের টাকাওলা না হলেও একজস্ট থেকে কালো ধোঁয়া বেরোনো ১৯৮২ মডেলের একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড চালু - অবস্থায় থাকা প্রিমিয়ার পদ্মিনী এবং কে এম ডিএ-র বাঘা যতীন খাল পাড়ের হাউসিং - এর টপ ফ্লোরে একটা ৪৭৫ বর্গফুটের লিলিপুটাকৃতির ফ্ল্যাট আমারও আছে। কিন্তু তুমি তাবল্লেকি হবে, যা বলার তা তো বলবে মিডিয়া।

আমার দাদা হীরকের এক বন্ধু আছে, প্রশান্ত, সে-ও ডাক্তার এবং তারও কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা, প্রতি বছর দুর্গাপুজোর ষষ্ঠীতে আমরা সে সারারাত ঠাকুর দেখি কলকাতায়, প্রশান্তদা স-পরিবারে ও স-মাতী অলটো আমাদের সাথে জয়েন করে। তো বছরে ঐ একবারই ওর সংগে দেখা হয় আর দেখা হলেই অবধারিত ‘কি ত, তোদের কারখানার কি খবর’ প্রশ্নটা এমনভাবে ছুঁড়বে যার শুদ্ধ বংগানুবাদ হচ্ছে, ‘কি রে, তোদের গরীব হতে আর কত দেরী?’

আমার বাবা মারা যান ১৯৭২ -এ, ওনার তখন মাত্র ৪৫ বছর বয়স। ক্লাস এইট - এর হাফইয়ার্লী পরীক্ষার ঠিক আগে তখন যেরকম ইনসিকিউরিটির মধ্যে পড়েছিলুম ঠিক সেই অবস্থাই যেন গত চার বছরে ফিরে এসেছিল আবার। অকালবৈধব্যের পর একা - হাতে তিনটি সন্তান মানুষ করার জন্য মায়ের দীর্ঘ লড়াইয়ের কথা মনে পড়ত এসময় প্রায়শই। সত্যি, পাস্ট ইজ নেভার ডেড!

নিজের এই মধ্যচল্লিশে দাঁড়িয়ে পেছনে তাকিয়ে যখনই দেখি, সেই ১৩ বছর বয়সে শু হওয়া নিরাপত্তার পেছনে দৌড় আমার কোনদিনই শেষ হয়নি। এই টানা দৌড়ই জীবনের সবকিছু ধবংস করে দিল।

পোলো বলে, বোলো না, দুর্গাপুরে এম এ এম সি-র কারখানা বন্ধহওয়ার পর তোমার ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজের ব্যাচমেট অর্ণবদা তো এখন রিলায়েন্সের কেবল্ পাতার কন্ট্রাকটারি করে বেড়াচ্ছে--- দুটো বাচচা মেয়ে নিয়ে একা দূর্গাপুরে কি বিপদে পড়েছে বলো তো দীপিকা!

সত্যিই, অর্ণব - দীপিকার সংগে আমরা পুরী - ভুবনেশ্বর - কোনারক বেড়াতে গিয়েছিলুম, ডলফিন পয়েন্ট দেখে চিল্কা পেরিয়ে রাজহংস দ্বীপে গিয়ে সমুদ্রের বেলাভূমির ওপর ওদের দুই মেয়ে আর আকাশ, তিন পুঁচকের নাচ, ও এ জীবনে ভোলা যাবে না। ঐ সন্ধেয় চিল্কা থেকে পুরী ফেরার সময় দীপিকা গাড়িতে আমার পাশে বসে। ঠেসাঠেসি করে বসার জন্য এগিয়েপিছিয়ে বসতে হয়েছিল। আমি গাড়ির বাঁদিকের দরজার পাশে এগিয়ে, অলটারনেটিভলি দীপিকা পিছিয়ে। বসে আমরা পিঠের ডানদিকে ওর বামস্তনটি সেই যে স্থাপন করল, পুরীতে ফেরা অবধি সে মংগলঘট আর ও স্থানচ্যুত করল না। সেই সন্ধে থেকেই আমার সম্পর্কটা বদলে যায়।দুটো বাচচা বিয়োনো বৌয়ের ব্যাপারে অর্ণবের একটুও পজেসিভনেস ছিল না--- এর বাড়ীতে ফোন করলে স্বল্পভাষী বৌ - ন্যাওটা অর্ণব কেমন নির্বিকারভাবে, ‘ধর, দীপিকাকে দিচ্ছি’, বলে বৌকে ফোনটা দিয়ে দিত। ফোনে প্রেমালাপের সময় একদিন বলেছিলুম দীপিকাকে, দীপু, অর্ণব এমনভাবে ‘ধর, দীপিকাকে দিচ্ছি’ বলে, শুনে মনে হয় তোমার হাতের ফোনটা নয়, যেন আমার হাতেই তোমায় তুলে দিচ্ছে।

এলাহাবাদে বর্ন অ্যাণ্ড ব্রট আপ লোরেটো কনভেন্টের প্রাক্তন ছাত্রীটির সটান উত্তর ছিল, সত্যিসত্যি দিতে গেলে তো দশ হাত দূরে পালাবে।

ঐ পুরী-ট্রিপে এক সন্ধেবেলায় মুক্ত পরিচ্ছন্ন বাতাসের সিন্ধুতীরে বসে নির্ভুল অ্যাকসেন্টে ক্লিফ রিচার্ডের দ্বপ্সন্তুত্রজন্দ্ব প্লন্তু দ্বড়ন্দ্বপ্লন্দ্ব ন্দ্রপ্সজত্র স্তুজন্দ্বপ্ল গেয়ে শুনিয়েছিল দীপিকা আমাদের। প্রকৃতই অর্ণবের চাকরিটা থাকলে চমৎকার হত--- বরকে এই আধবুড়ো বয়সেই ভি আর এস দিয়ে বসিয়ে দেওয়া ডিপ্রেশনে ভুগে ভুগে দীপিকা কেমন সতী হয়ে গেল!

দূর্গাপুরের এম এ এম সি বা কুলটি ইউনিটের মত আমাদের ইউনিটটাও বন্ধহয়ে গেলে, এই মধ্যচল্লিশে নতুন করে বেক

ারহয়ে গিয়ে যদি অর্ণবের মত আবার ট্র্যাচ থেকে শু করতে হত, তবে---। নাঃ, সে কথা ভাবলেও হাড় হিম হয়ে যায়! যখনই যেখানে থেকেছি, নিরাপত্তাহীন মানুষেরা আর আমার নিজের নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ার আশংকাও পাশাপাশি থেকে গেছে। এভাবেই। অথচ সকালবেলা 'দ্য টেলিগ্রাফ' - টা যখন পড়ি মনে হয় গোটা পৃথিবীটা শুধু কোটিপতিদের দিয়েই গড়া! নাম রেখেছি গ্লোবালাইজেশনের গোয়েবলস্, মনে মনে!

এত ঘটনাপরম্পরায় গুড়িয়ার অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে থাকার ব্যাপারটা ভুলে যেতে পেরেছিলুম। সোমবার মানে আজ সক ালেমর্নিং ওয়াক সেরে এসে--- যেহেতু কাগজ পড়া নেই, গতকাল ১৫ই আগস্টের জন্য কাগজের অফিস ছুটি থাকায় ক াগজ বন্ধ; কাগজ পড়ার জন্য বরাদ্দ সময়টাতে মিলারের 'দি এয়ারকণ্ডিশন্ড নাইটমেয়ার' - টা নিয়ে লেখার টেবলে বসি। মিলার এখন সভ্যতার ব্যাকডোর শিকাগোর দক্ষিণ দিকে মেক্কা অ্যাপার্টমেন্টে এসেছেন, একটি পুষ ও নারী ব্য ালকনির রেলিং-এর ওপর দিয়ে ঝুঁকে মিলার ওতাঁর বন্ধুর দিকে তাকিয়ে আছে, অভিব্যক্তিহীন! ঐ তাকিয়ে থাকার মধ্যে আমি আমার দিকে গুড়িয়ার অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকাটাতে দেখতে পেলুম আবার।

ঐ ভাবে কি দেখছিল ও আমার মুখে? ও কি যখন কম বয়সে ভয়ানক বদমাইস ছিল, ওর প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে উত্যক্ত হয়ে ত াড়া করলে, দূরে পালিয়ে গিয়ে বেহায়ার মত হাসত, ওর বাবা জন যখন বেঁচেছিলেন, সেই চলে - যাওয়া আনন্দ - সময়ের স্বপ্ন দেখছিল? মিলার বলছেন, না, তা নয়---

'Just looking. Dreaming? Hardly. Their bodies are too worn, their souls too stunted, to permit indulgence in that cheapest of all luxuries.'

পোলো ডাকে, চা দিয়েছে।

লেখার টেবল ছেড়ে উঠে গুণ্ডার ঘরের বিছানায় যাই, ওখানে বসেই আমরা দাঁত মাজার আগের চা-টা খাই। চা দিয়ে প াল চলে যায়--- ও আমাদের কলোনীর বাইরে জি টি রোডের যে দিকে আমাদের কলোনী, তার উল্টোদিকে ই সি এল - এর কলোনীর একটা বাড়ীতে কাজ করে। সেই কাজ সেরে ও আবার এগারোটা নাগাদ বাকি কাজ করতে আসবে আম াদের বাড়ি। ওকে আউটহাউসের পাশের স রাস্তাটা দিয়ে চলে যেতে দেখি জানালা দিয়ে। কিন্তু অব্যবহিত পরেই ও আব ার ফিরে আসে, জানালার পাশে দাঁড়িয়ে পোলোকে ডাকে কাঁদছিল, সবাই ভেবেছে খিদেতে কাঁদছে, গুড়িয়ার বরটা তো চুরি করে ধরা পড়ার পর পালিয়েছে, গত তিন চার দিন খাবার জুটছে না, পাশের ঘরের মেয়েটা সাহেবের বাড়ি থেকে রা ত্তিরে যে খাবারটা পায় সেটা নিজে না খেয়ে ওদের দিয়ে দিচ্ছিল, নিজে রাত্তিরে বেঁধে নিত, গোটা দিনের খিদে কি তাতে মেটে! যে দড়িটা গলায় দিয়েছে সেটা একটা পাতলা দড়ি, নেহাৎ শরীরে কিছু ছিল না তাই, না হলে ঐ দড়িতে গলায় ফঁ াস দিয়ে ঝুললে দড়িটাই ছিঁড়ে যেত!

রাতে খেতে বসে পোলোকে জিজ্ঞেস করি, গুড়িয়ার বাচচাটার কি হল?

পোলো বলে, জনের প্রথম পক্ষের একটা মেয়ে ছিল না--- বাচচাটা গুড়িয়ার সেই সৎ বোনের কাছে আছে, আউটহ াউসের স রাস্তাটার পাশে নালীর গা ঘেঁষে আমাদের কলোনীর যে পাঁচিলটা, ওটার ওধারে একটা বাড়ীতে একটা লোক আছে আটো চালায়, ওদের বাচচা নেই, ও আর ওর বৌ বাচচাটাকে নিতে চেয়েছিল, গুড়িয়ার সৎ-দিদি দেয় নি।

আমি জিগেস করি, ওরও কি বাচচা নেই?

পোলো বলে, নেই মানে, তিন চারটে বাচচা, কে নাকি ওকে বলেছে এরকম অনাথ বাচচা--- যাকে দেখার কেউ নেই, তাকে দেখাশোনার দায়িত্ব নিলে সরকারী কোনো স্কিমে মাসিক কিছু টাকা পাওয়া যায়, সেই টাকার লোভে বাচটাটাকে ছাড়তে চাইছে না---।

আকাশও আমাদের সংগে খেতে বসেছিল, সামনেই ওর ক্লাস টেনের হাফ ইয়ার্লী পরীক্ষা -- পড়ার চাপের চিহ্ ওর চে াখে মুখে, ওকে বলি, 'জানিস বাবাই, আমরা যখন কলেজে পড়ি, সেভেনটিজ-এর শেষ দিকটায়, ইউরোপের যে তিনজন ইনটেলেকচুয়ালকে আমরা ঈশ্বরপ্রতিম ভাবতুম, তাঁরা হলেন কাম্যু, কাফকা আর সার্ত্র। এই জাঁ পল সার্ত্র--- তাঁর বন্ধু জাঁ জেনেকে নিয়ে একটা লেখা লেখেন তার নাম সন্ত জেনে। সার্ত্র যাকে সাধু জেনে বলছেন তিনি কিন্তু আসলে ছিলেন একজন চোর।' সমকামী বলতে মুখে আটকায় বলে চোর অবধিই বলি। '১৯১০ সালে যখন হ্যালীর ধুমকেতু পৃথিবীর ক াছে আসে সদ্যোজাত জাঁ জেনেকে পাওয়া যায় পারীর একগির্জায়। আর শেষবার হ্যালীর ধুমকেতু পৃথিবীর কাছে

এসেছিল ১৯৮৬ সালে, ঐ বছরই জেনে মারা যান পারীর এক হোটেলে নিঃসংগ অবস্থায়। এই গুড়িয়ার বাচচাটার মত অনাথ জেনে - কেও এক চাষী পরিবার নেয় কারণ সেসময়ে অনাথ শিশুকে ঠাঁই দিলে ফরাসীসরকারের কাছ থেকে তার ভরণপোষণের খরচা হিসেবে অর্থসাহায্য পাওয়া যেত। এভাবে টাকার হিসেব কষে বাচচা যারা নেয়, তাদের বাড়ীতে গিয়ে অরফ্যানরা আসলে অরফ্যানই থেকে যায়! গরীব লোকেদের গল্প কেমন চিরকাল একই রকমের থেকে যায়, তাই ন া!'আমি হাসি, 'জাঁ জেনে প্রসংগে যে লেখাই পড়িস, দেখবি হ্যালীর ধুমকেতুর কথাটা খুব ওঠে, লোকে আসলে অ্যান ালজি খোঁজে তো, গ্রহনক্ষত্রের মধ্যে হ্যালীর ধুমকেতুর অরবিট যেমন অদ্ভুত, শিল্পীসাহিত্যিকদের মধ্যে জেনে-র জীবনের কক্ষপথটাও পিকিউলিয়ার। কিরকম নিরংকুশ একা। সেভেন্টি সিক্স ইয়ার্স অভ সলিচিউড!' আকাশ কি আমার কথা বুঝছে? না বুঝুক, আমায় তো বলে যেতে হবে ওকে। 'গুড়িয়ার ছেলের জীবনের শুরটার সংগেও জেনে -র জীবনের শুট ার একটা অ্যানালজি টানা যায়, কি বল? মা টিবি রোগী, বাবা চোর; মা গলায় দড়ি দিয়ে মারা যাবার চারদিন আগে ব াবা চুরি করে ধরা পড়ার ভয়ে বেপাত্তা; একটা হামা - দেওয়া শিশু--- পৃথিবীতে নিরংকুশ একা, এ ব্যাটা আরেকটা জেনে না হয়ে যায় না, কি বলিস--- অবশ্য যদি ওর গল্পটাও ওর মায়ের গল্পের মত হঠাৎ করে ফুরিয়ে না যায়---' আমি হ াসতে থাকি।

হাসব না তো কি কাঁদবো!

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com